পথিকৃৎ চার্ল্স ডারউইন ও আধুনিক জীববিদ্যা

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

২০০৯ সনে চার্ল্স রবার্ট ডারউইনের ২০০তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হবে সারা বিশ্বব্যাপী। এই নিয়ে জীববিদ (বায়োলোজিস্ট) মহলে এখন থেকেই বেশ সাড়া পড়ে গেছে। ডারউইনকে কেবল যে জীববিদদের মহাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে তাই নয়, সারা বিশ্বের সেকুলারিস্ট যারা প্রবর্তিত ধর্মগুলোর ওপর আস্তাহীন তাদেরও এক নম্বর পুরুষ বলে গণ্য করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রকৃতিবিদ (নেচারালিস্ট) তাঁর ধী-শক্তি দিয়ে অভিব্যক্তিবাদ (থিওরী ওফ ইভোলিউশন) যে ভাবে স্থাপন করেছেন তা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

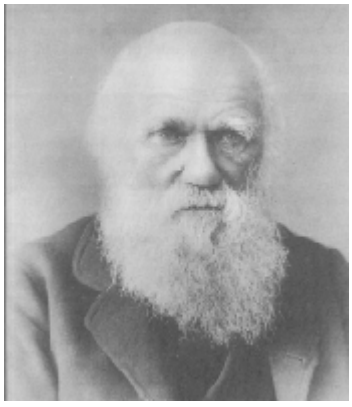

চার্ল্স রবার্ট ডারউইন, গ্রেগর মেন্ডেল

যদিও প্রকৃতিবিদ ডারউইন ও সুপ্রজননবিদ্যা (জেনেটিক্স) এর জনক গ্রেগর মেন্ডেল সমসাময়িক ছিলেন তবে মেন্ডেলের প্রজননবিদ্যার সুত্রগুলো ডারউইনের সম্ভবত জানার কথা নয় এই জন্যে যে মেন্ডেলের সুত্রগুলো ১৮৬৫ সনে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রেগর মেন্ডেল তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন মটরসূটি শষ্য নিয়ে আবার অন্যদিকে ডারউইন প্রকৃতিবিদ হিসেবে ঝুকে পড়েছিলেম প্রাণীকূলের দিকে। মেন্ডেল তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন 'জিনস্' এর দিকে আর ডারউইন দেখছিলেন কি ভাবে 'স্পেসিয়েশন' বা 'স্পিসিজ' এর ক্রম-বিবর্তন হয় যেমন একপ্রকারের ফিঞ্চ পাখী অন্যপ্রকারের ফিঞ্চ পাখী থেকে আলাদা হয়ে এক নুতন স্পিসিজে পরিণত হয় এ'সব নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করতেন। তথ্যগত দিক থেকে মেন্ডেল ছিলেন 'মাইক্রো' বা সুক্ষ তথ্যের অনুরাগী আর ডারউইন ছিলেম 'মেক্রো' বা মোটা (বা পুরো) তথ্যের অনুসন্ধানী। এই দুই মহামানুষ সত্যের অনুসন্ধানে মগ্ন ছিলেন উনিশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে যদিও মেন্ডেল ছিলেন চার্চের যাজক আর ডারউইন ভেবেছিলেন ধর্মশাস্ত্র নিয়ে তিনি ক্যাম্ব্রিজে স্নাতক লাভ করবেন। এই দুই মনীষীর জ্ঞানার্জনে জীববিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটলো পুরো বিংশ শতাব্দী ধরে। আজ যে 'হিউম্যান জিনম' নিয়ে এত গবেষণা হচ্ছে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে সেটাও কিন্তু মেন্ডলের 'জেনেটিক্স' ও ডারউইনের অভিব্যক্তি বা

‘ইভোলিউশন’ থিওরীর কারণেই হচ্ছে।

আমরা যারা ফলিত প্রাণীবিদ্যা বিভাগে ‘রিকম্বিনেন্ট ডি এন এ’ পদ্বতি দ্বারা ‘মিউটেশন’ বা ‘জীন’ এর ‘ডি এন এ সিকুয়েন্স’ অদল-বদল করি, মুলতঃ আমরা লেবরেটোরি’ বা বিজ্ঞানাগারে ‘এক্সপেরিমেন্টাল ইভোলিউশন’ই করছি। প্রকৃতিও ‘মিউটেশন’ দ্বারা ‘জীন’ এর ‘সিকুয়েন্স’ এ হেরফের তৈরী করছে তবে এর পরিমাণ এত কম যে লাখ লাখ বছর লেগে যাবে জীবের (ব্যক্টেরিয়া বা ইউকেরিয়ট) ‘ফিনোটইপ’ বা বাহ্যিক চেহারা আদল-বদল হতে। দুটো প্রাণী যারা এখন দুটো ‘স্পিসিজ’ এ পরিনত হয়েছে তাদের সময় লেগেছে লাখ লাখ বছর। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে রিকম্বিনেন্ট ডি এন এ’ পদ্বতি দ্বারা ‘মিউটেশন’ বা ‘জীন’ এর ‘ডি এন এ সিকুয়েন্স’ অদল-বদল করে ‘ফিনোটিপিক’ বা বাহ্যিক ‘চেঞ্জ’ করতে বৈজ্ঞানিকদের সময় লাগবে অনেক কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ এখন নিজেদের স্বার্থে ‘এক্সপেরিমেন্টাল’ অভিব্যক্তি দ্বারা এমনসব ব্যক্টেরিয়া বা ইস্ট (yeast) কোষ তৈরী করবে যেগুলো মানবজাতির নানান কাজে লাগবে। উদাহরণ সরূপ বলা যেতে পারে যে আজকাল যে ‘ইনসুলিন’ হোরমন ফার্মাসীতে বিক্রয় হয় তা ‘ইকোলাই’ নামে একরকমের ব্যক্টেরিয়া যেটি বিজ্ঞানাগারে বিশেষভাবে নির্মান করা হয়েছে তা’দ্বারা তৈরী। সহস্র কোটি বছরের অভিব্যক্তির পর ব্যক্টেরিয়া থেকে ইউকেরিয়ট কোষ তৈরী হবার পর ‘ম্যামালিয়ান’ (mammalian) জন্তু (শুকর, গরু-ছাগল, কুকুর এসব প্রাণী) পৃথিবীতে এসেছে। এসব জাতীয় প্রাণীরাই কেবল ইনসুলিন হোরমন তৈরী করতে সক্ষম। ব্যক্টেরিয়া এর ‘জিনোম’ এ ইনসুলিন হোরমন এর জীন অনুপস্থিত। ‘ম্যামালিয়ান’ জন্তুর সব কোষে কিন্তু ইনসুলিন জীন এর বহির্প্রকাশ (expression) হয় না; হয় কেবল প্যান্ক্রিয়াসের এক বিশেষ টিস্যু যার নাম হচ্ছে islets of langerhans আর সেখানকার ‘বেটা’ (beta) কোষেই কেবল ইনসুলিন জিনের বহির্প্রকাশ ঘটে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে জেনেন্টেক কম্পানীর বিজ্ঞানাগারে এক ‘ইকোলাই’ ব্যক্টেরিয়ার জীনোমে মানুষের ইনসুলিন জীন ঢুঁকিয়ে দেয়া হলো। তাতে করে এই পরিবর্তিত ব্যক্টেরিয়া (transformed bacteria) মানুষের প্যান্ক্রিয়াসে যে ইনসুলিন তৈরী হয় তা তৈরী করতে লাগলো। তবে এই ‘রিকম্বিনেন্ট’ ইনসুলিনগুলো ঠিকমত ভাজ বা folding না হওয়াতে এর কার্যক্ষমতা ছিল শুন্য মাত্র। তবে প্রোটিন রসায়নবিদরাও কম নন। এরা টেস্ট-টিউবে unfolded ইনসুলিনগুলোকে রসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঠিকমত ভাঁজ বা folded করলে মলিকিউলগুলোর কার্যক্ষমতা ফেরৎ আসে। সারা বিশ্বে লাখ লাখ লোক যারা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস রোগে ভোগেন তারা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিয়ে ক্লিনিক্যালি সুস্থ জীবনযাপন করছেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার একটি মাত্র উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করলাম যেটি কিনা ডারউইনের ক্রম-অভিব্যক্তির এক সুক্ষ অভিজ্ঞান!

সভ্য ও আধুনিক পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ অধিবাসীরা আমাদের দেশের লোকদের মত কপাল বা fate এর ওপর আস্থাশীল নয়। এরা নিজেদের কপাল নিজেরাই খেটেখুটে গড়ে। ধর্ম যেটিকে আমি ‘ব্লাইন্ড বিলিফ্ সিস্টেম’ এর অন্তর্ভুক্ত করি সেটি থেকে এরা অনেক তফাৎ থাকে। এই কারণে এরা মুক্ত চিন্তা করতে আগ্রহী হয়। চার্ল্স ডারউইন যে পরিবারে জন্ম নেন সে পরিবারেও মুক্তচিন্তা করার মত অবকাশ ছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে ডারউইনের দাদা ইরাস্মাস্ ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন। দৈববিপাকে তিনি যদি একজন পাঁড় খেঁরেস্তান হতেন তাহলে চার্ল্স ডারউইন এত বড় প্রকৃতিবিদ হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

চার্ল্স এর বাবা রবার্ট ডারউইন ছিলেন একজন চিকিৎসক; তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহ প্রদান করতেন প্রচুর। ১৮২২ সনে চার্ল্স যখন মাত্র তেরো বছর বয়সের ছাত্র ছিলেন তখন তিনি তাঁর বড় ভাই ইরাস্মাস-কে রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য তাঁদের বাড়ীর পেছনে লনে এক রসায়নাগারে গবেষণা করতে সাহায্য করেছেন। এর ফল সরূপ তিনি কি ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বা hypothesis দাঁড় করতে হয় এবং গবেষণার জন্য যে 'কোন্ট্রল সেম্পেল' অবশ্যই রাখতে হয় তা তিনি অপরিনত বয়সে শিখে ফেলেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে নিজ বাড়ীর আভ্যন্তরীন ইন্টালেকচুয়াল বা মুক্ত পরিবেশের জন্যই চার্ল্স ডারউইন এতবড় একটা প্রাকৃতিক রহস্যের উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উনিশ শতকে ডারউইনের পরিবার একটা ভীষণ মুক্তচিন্তা করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। চার্ল্সের বাবা রবার্ট তাঁর ছেলেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়বার জন্যে স্কটল্যান্ডের ইডেনবরায় পাঠান। চার্ল্সের বড় ভাই ইরাস্মাস ও ক্যাম্ব্রিজে ডাক্তারী শাস্ত্র পড়ছিল। কিন্তু চার্ল্স মেডিক্যাল লাইনে পড়াশুনা করতে একেবারেই গররাজী। সেখানে দু''বছর পড়ার পর তিনি বাসায় ফিরেন। বাবাকে বললেন ডাক্তারী শাস্ত্র তার জন্য নয়। ইডেনবরা থেকে ফেরৎ আসার পর তিনি ক্যাম্ব্রিজে 'থিওলজী' বা ধর্মশাস্ত্র পড়তে জান। কিন্তু এদিকে ইডেনবরায় থাকাকালীন চার্ল্স বেশ কিছু জ্ঞানলাভ করে নানান একাডেমিক বিষয় এ : যেমন ১। মৃত জন্তুকে কি ভাবে stuffing করতে হয় তা শেখেন; ২। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করেন; ৩। প্রকৃতি বিজ্ঞান যাদুঘর পরিদর্শ্ন করে জ্ঞানলাভ করেন; ৪। প্লিনিয়ান সোসাইটিতে যোগ দিয়ে তর্ক-বিতর্কে সামিল হতেন যেখানে মারিন বায়োলোজি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন; ৫। প্রাণীবিদ প্রোঃ রবার্ট গ্রান্টের সাথে দুরহ টপিক্স নিয়ে আলাপ আলোচনায় যোগ দিতেন। এই অধ্যাপক গ্রান্ট ডারউইনকে ক্রম-অভিব্যক্তি বা 'ইভোল্যিউশন' ফিল্ডের সাথে সম্যক পরিচয় করান। অধ্যাপক গ্রান্ট লামার্কিয়ান অভিব্যক্তির সমর্থক ছিলেন এবং এই কারণে তিনি চার্লসের সাথে এই ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। তাই একদিক থেকে মনে হয় চার্লসের স্কটল্যান্ড গমন তাও আবার এই অপরিনত বয়সে - এটা তাঁর জ্ঞান অনুসন্ধিৎসায় অনেকটা সহায়ক হয়েছিল।

মুক্ত-মনা যে ১২ই ফেব্রুয়ারীতে অন্য সব বড় ও নামী প্রতিষ্ঠানের সাথে এক হয়ে 'ডারউইন দিবস' পালণ করতে যাচ্ছে তার জন্য তারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বিজ্ঞানের মহা-পুরুষ ডারউইন বলতে গেলে একক ভাবে মানব জাতিকে ধর্মের নাগপাশ হতে বের করে নিয়ে এসেছেন তাঁর জ্ঞানলব্ধ অভিব্যক্তি থিওরী দ্বারা। আজ জীববিদ্যার যত জয়জয়াকার চারিদিকে দেখি তার প্রধান উৎস কিন্তু ডারউইনের ক্রমবিবর্তন বা অভিব্যক্তিবাদ। এরকম একটি আনন্দমুখর দিনে ডারউইনের থিওরী, তাঁর জীবন, ও তাঁর দর্শন নিয়ে লিখালিখি করতে এবং এ'সব নিয়ে অন্যান্যদের লিখা পড়তে আমি বেশ আগ্রহী। চলুন, আমরা আজ এটাই প্রতিজ্ঞা করি যেন এই মহা-পুরুষের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান দিয়ে আমরা পুরো মানবজাতির অন্তর চক্ষুর উন্মীলন করতে সক্ষম হই যেটি দিয়ে তারা জ্ঞান অন্বেষণে মেতে উঠতে পারে।

সর্বশেষে আমি যোর গলায় এটিই বলতে চাই যে, আমার একান্ত ধারণা ধর্মের লেন্স চোখে সেঁটে যারা পৃথিবী দর্শন করেন তা'দের মধ্যে কেউ কেউ যদি ডারউইনবাদে আস্থা আনেন এবং উদার এক দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা সমূহকে অবলোকন ও বিশ্লেষণ করেন, তা'হলেই কেবল এই মর্ত্যলোকে শান্তি কোনদিন আসলেও আসতে পারে। গত দু'দশক ধরে ধর্মের জিগির তুলে চারিদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী করা হয়েছে। এমত এই

সঙ্কুল অবস্থায় পৃথিবীর লোকরা যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে এই ধরার যাবতীয় ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণ করতে পারে তার দিকে আমাদের সতত দৃষ্টি রাখতে হবে। উপরন্তু, সারা বিশ্বের জনসাধারণের অ-বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি কি ভাবে বদলানো যায় সেটিই হবে আমাদের জানার বিষয়। ডারউইন দিবসে প্রকাশিত অন্যান্য রচনাবলী হয়ত আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বদলানোর নিমিত্তে অশেষ সহায়ক হবে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের ক'জন লোক বিশেষ মনযোগ দিয়ে এসব সারগর্ভ লখা পড়তে আগ্রহী হবে? তবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের কেউ কেউ যদি এই লিখাগুলো পড়ে তাতেও কিন্তু অনেকটা কাজ হবে। এই সামান্য একটি আশা নিয়ে আমি আজকের এই সংক্ষিপ্ত রচনাটির ইতি টানলাম।